এই সংখ্যায় ভিতরের পাতায়
√ জলাতঙ্ক—আরেক নাম মৃত্যু
√ যারা হারিয়ে যাচ্ছে
√ জলদূষণ ও জলবাহিত রোগ
√ ভারতের মধ্যযুগে বিজ্ঞান
√ পর্যবেক্ষণ শিবির
√ প্রশ্নোত্তর

বিজ্ঞান অন্বেষক

✆ 25890019(R)
Subrata Das
Club Member Agent
Life Insurance Of India (Kalyani Branch)
Residence: Purbasha, Gokulpur
P.O. Kantaganj- 741250

বর্ষ -১ | তৃতীয় সংখ্যা | মে-জুন /২০০৪ | দাম ১টাকা

পাখিদের কথা

বসন্তে ডালে ডালে ফুলের আগুন লেগেছে। রঙ বেরঙের পাখিরা মধুর লোভে ঠোঁট চুবিয়ে নিচ্ছে রঙবেরঙা ফুলে ফুলে। মধুলোভী পতঙ্গের আনাগোনা ওত্ পেতে লক্ষ্য করছে কিছু পাখি। এইসব বসন্ত উৎসবের সংবাদ পেয়ে একদল পাখি বেড়িয়ে পড়লো তাদের ঢাউস মার্কা কুড়ুল ঠোঁট নিয়ে। তারপরই নিস্তব্ধ জঙ্গলের গাছে গাছে আওয়াজ উঠলো ঠক্-ঠক্-ঠকররর্ ... ঠক্-ঠক্-ঠকররর্। হ্যাঁ, বন্ধুরা ঠিকই আন্দাজ করেছো তোমরা; এরা কাঠঠোকরা পাখি।

কাঠঠোকরা Peciformes বর্গের অন্তর্গত পাখি। এদের দুটি বৈশিষ্ট অন্য প্রজাতির পাখিদের থেকে এদেরকে আলাদা করেছে। প্রথমটি হল এদের জিভের দৈর্ঘ্য

এরপর ৩ পাতায়

অলৌকিক নয় বিজ্ঞান

নখদর্পণে চোর ধরা পড়ে না

বিশ্বাস : মন্ত্রের সাহায্যে নখদর্পণের মাধ্যমে চোরকে ধরা যায়।

বিজ্ঞান : চোর ধরা নখদর্পণের সাহায্যে কোন ভাবেই সম্ভব নয়। এক্ষেত্রে শুধুমাত্র চালাকি বা কৌশলের আশ্রয় নেওয়া হয়। এই পদ্ধতির জন্য সাধারণত যে বাড়ির জিনিস চুরি হয়েছে সেই বাড়ির কাউকে বেছে নেওয়া হয়। গুণিন একজন মহিলা বা কিশোরী বা মানসিকভাবে দুর্বল কোন পুরুষকে বেছে নেয় যার নখে চোর

এরপর ৬ পাতায়

তাপবিদ্যুৎ কেন্দ্রের ছাই কিছু কথা

তাপবিদ্যুৎ কেন্দ্রের ছাই থেকে তৈরি ইট।

সভ্যতার অগ্রগতিকে সচল রাখার জন্য চাই শক্তি। বর্তমান সভ্যতা অনেকাংশেই বিদ্যুৎশক্তির উপর নির্ভরশীল। প্রয়োজনীয় বিদ্যুতের অনেকটাই আসে তাপ বিদ্যুৎ কেন্দ্র থেকে। তাপ বিদ্যুৎ কেন্দ্রে জ্বালানী হিসাবে ব্যবহার করা হয় কয়লা। কয়লা পুড়িয়ে তাপ পাওয়া যায়, সেই তাপে জল গরম হয়। গরম জল বাষ্প হয়। বাষ্পের সাহায্যে টারবাইন ঘোরে। ঘুরন্ত টারবাইন জেনারেটরকে ঘুরিয়ে উৎপন্ন করে বিদ্যুৎ। যদিও প্রকৃতপক্ষে তাপবিদ্যুৎ কেন্দ্রে আরো জটিল যন্ত্রপাতি, জটিল ব্যবস্থা থাকে। তবে মূল ব্যাপারটা হল বিদ্যুৎ পেতে গেলে দিতে হবে তাপ, তাপ পেতে গেলে পোড়াতে হবে জ্বালানী, আর পৃথিবী জুড়ে জ্বালানী হিসাবে বেশিরভাগ ক্ষেত্রে ব্যবহার করা হয় কয়লা, কয়লা পুড়ে তাপ দিয়ে নিভে যাওয়ার সময় স্মৃতিচিহ্ন হিসাবে রেখে যায় ছাই যা এক জ্বলন্ত সমস্যা। সম্পূর্ণভাবে পোড়ানোর জন্য কয়লাকে গুঁড়ো করে ফারনেসে ব্যবহার করা হয় আর এর ফলে ছাই সমস্যা গুরুতর আকার ধারণ করে। চিমনি দিয়ে ধোঁয়ার সাথে যে সূক্ষ্ম ছাই বাতাসে মিশে যায় তাকে বলে ফ্লাই অ্যাশ (Fly ash) এই ফ্লাই অ্যাশ বাতাসে ভেসে ছড়িয়ে পরে দূরদূরান্তে। তাপবিদ্যুৎ কেন্দ্রের আশেপাশের অঞ্চলে ঘরের আসবাবপত্র বাড়ির ছাদ এই ছাইয়ে ঢেকে যায়। বাতাসের সঙ্গে ছাই শরীরে প্রবেশ করে শ্বাসকষ্ট জনিত রোগ সৃষ্টি করে। ভারতে বর্তমানে ৯০০ লক্ষ টন ছাই উৎপন্ন হয়। সব ছাই চিমনি দিয়ে বেরোয় না। ডাস্ট কালেক্টর, ইলেকট্রোস্ট্যাটিক প্রেসিপিটেটর প্রভৃতি যন্ত্রের সাহায্যে এই উড়ন্ত ছাইকে আটকানো হয়।

এর পর ২ পাতায়

প্লুটোর ওপারে

সৌরজগৎ বলতে আমরা কি বুঝি? সূর্য, তার চারপাশে ঘূর্ণায়মান নয়টি গ্রহ, ধূমকেতু ও উল্কা? প্লুটোর কক্ষপথই কি সৌরজগতের সীমানা? না। সৌরজগতের সীমানা প্লুটোতেই শেষ নয়। প্লুটোর পরেও রয়েছে সৌরজগতের এক বিশাল অংশ। জ্যোতির্বিজ্ঞানীরা হিসাব করে দেখিয়েছেন যে সৌরজগতের ব্যাসার্ধ ৩০ ট্রিলিয়ন কিমি (১ ট্রিলিয়ন হল একের পিঠে আঠারোটা শূন্য)। সূর্য থেকে প্লুটো মাত্র ৫৯০০ মিলিয়ন কিলোমিটার দূরে। সূর্যকে কেন্দ্রে রেখে ৩০ ট্রিলিয়ন কিমি ব্যাসার্ধের একটি গোলকই সৌরজগতের আধার। এর থেকে সহজেই অনুমান করা

এর পর ৫ পাতায়

বন্ধ জলাশয় ভগ্ন হৃদয়

সকালবেলা তখন পূবের আকাশ রাঙা হয়নি, হঠাৎই ঘুম ভেঙে গেল একটা ঘড় ঘড় আওয়াজে। পাড়ার ইটপাতা রাস্তা দিয়ে গঙ্গার মাটি বোঝাই একটা ট্রলি (ট্রাক্টরের সাথে যুক্ত একটা ট্রলি) ঢুকল আমাদের পাড়ায়। ব্যাপারটা কি দেখবার জন্য জানালা দিয়ে উঁকি দিতেই লক্ষ করলাম অমল বণিকের পুকুরে মাটি ফেলা হচ্ছে। এই এলাকায় পুকুর ভরাট করে জমি কেনা বেচা ও ঐ জমিতে বড় বড় বাড়ি তৈরি করে বিক্রি করা কোনো ব্যাপারই নয়। পুকুর/জলাশয়/নয়নজুলি

এরপর ৩ এর পাতায়

তাপবিদ্যুৎ

১ পাতার পর

আটকে পড়া ছাই জমা হয় নিচে। একে বলে বটম অ্যাশ। এই জমা ছাই (চিমনিতে বা যন্ত্রে) জলের সঙ্গে মিশে পাইপের মাধ্যমে জমা হয় ছাই রাখার পুকুরে (অ্যাশ পন্ড)। পুকুরে জমা ছাইকে বলে পন্ড অ্যাশ (Pond ash)।

ছাই সমস্যা বাস্তব চিত্র : ব্যান্ডেল তাপবিদ্যুৎ কেন্দ্রের আশেপাশের মানুষ ছাই সমস্যায় তিতিবিরক্ত হয়ে আটের দশকে গঠন করে 'ছাই পীড়িত নাগরিক কমিটি। কমিটির দাবী মেনে ব্যান্ডেলে বসানো হয়েছিল ইলেকট্রোস্ট্যাটিক প্রেসিপিটেটর। কিন্তু বিপুল পরিমাণ ফ্লাই অ্যাশকে আটকাতে এ যন্ত্র অক্ষম। তাই ছাই সমস্যা পূর্ববৎ রয়ে গেছে। কোলাঘাটের তাপবিদ্যুৎ কেন্দ্রের উৎপন্ন ছাই বিদ্যুৎ কেন্দ্রের ৫ কিমির ভেতরে ফেলার ব্যাপারে নিষেধাজ্ঞা থাকলেও তা মানা হয় না। চাষীদের লোভ দেখানো হচ্ছে ছাই চাপা জমিতে ফুলচাষ ভালো হবে। পরিস্থিতি ভয়ঙ্কর হচ্ছে দেখে স্থানীয় মানুষ গড়ে তোলেন পরিবেশ দূষণ প্রতিরোধ কমিটি। কমিটির চাপে সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়, কোন জলাভূমি, পুকুর, জমিতে ছাই ফেলা চলবে না। কিন্তু ঠিকাদারদের আছে নিজস্ব আইন। তাই ছাই ফেলা চলছে। মজে গেছে দেনান খাল। ১৯৮৩ সালে টিটাগড়ে গড়ে ওঠে তাপবিদ্যুৎ কেন্দ্র। এই কেন্দ্রের অগ্রগতির সাথে সাথে বুজে যেতে থাকে আশেপাশের পুকুর, নিচুজমি। দমদম, শ্যামনগর, নৈহাটি, কাঁচরাপাড়ায় লরি, ট্রাক বাহিত হয়ে ছড়িয়ে পড়ে এই ছাই।

ছাই সমস্যা, সরকারী নির্দেশ : ১৯৯৯ সালের ১৪ সেপ্টেম্বর The Gazette of India (Extra Ordinary) তে ভারত সরকারের পরিবেশ ও বন দপ্তর ফ্লাই অ্যাশ সম্পর্কে বিশেষ বিজ্ঞপ্তি জারি করেন। বিজ্ঞপ্তিতে যে নির্দেশনামা আছে তার সারমর্ম হল—

১) তাপবিদ্যুৎ কেন্দ্রের ৫০ কিলোমিটারের মধ্যে অবস্থিত ইট, টালী প্রস্তুতকারকদের মাটির সঙ্গে কমপক্ষে ২৫ শতাংশ ছাই ব্যবহার করতে হবে। ২) ছাই ব্যবহার ব্যবস্থার তদারকির ভার দেওয়া হয়েছে কেন্দ্রীয় ও রাজ্য দূষণ নিয়ন্ত্রণ পর্ষদকে। ৩) ছাই ব্যবহারকারী শিল্পসংস্থাকে বিনা খরচে ছাই সরবরাহ করতে বলা হয়েছে। ৪) রাজ্য ও কেন্দ্রের বিদ্যুৎ উৎপাদন কেন্দ্রকে শিল্প সংস্থাগুলিকে ছাই ব্যবহারে উৎসাহিত করতে বলা হয়েছে। ৫) ছাইয়ের বহুমুখী ব্যবহারের (রাস্তা তৈরি, নীচু জমি উদ্ধার, নদীর ধার বাঁধানো, পরিত্যক্ত খনি বোজানো) প্রচলনে উদ্যোগী হতে বলা হয়েছে।

কিন্তু এই নির্দেশনামায় সুকৌশলে এড়িয়ে যাওয়া হয়েছে তাপবিদ্যুৎ কেন্দ্রের ছাইকে বিপজ্জনক বর্জ্য হিসাবে ঘোষণার দাবীকে। সরকারী দৃষ্টিভঙ্গি হচ্ছে ছাইয়ের ব্যবহার বাড়লেই সমস্যা কমবে। এই দৃষ্টিভঙ্গিতে জোর দেওয়া হয়েছে ছাই ম্যানেজমেন্টের ওপর।

ছাই ম্যানেজমেন্ট যা হচ্ছে : আইনে বলা আছে অ্যাশ পন্ড না থাকলে তাপ বিদ্যুৎ কেন্দ্র গড়ার অনুমতি দেওয়া হবে না। কিন্তু ঐ পুকুর ছাইয়ে বুজে গেলে কি করতে হপে সে বিষয়ে কিছু বলা নেই। ছাই বহন করার সময় তা ভালোভাবে ঢেকে নিয়ে যাওয়ার নির্দেশ থাকলেও ঢাকা দেওয়া হয় আইন বাঁচাতে, ছাইকে ওড়ার হাত থেকে বাঁচাতে নয়। ১৯৯৯ সালের জুন মাসে ইটভাটার মালিকদের সঙ্গে পর্ষদের বৈঠকে ঠিক হয় ভাটা মালিকরা ছাই দিয়ে ইট তৈরি করবে। কিন্তু প্রতিশ্রুতিই দেওয়া হয়। অনেক ইটভাটা মালিক অবশ্য ছাই নিয়ে যায় তবে ইট তৈরির জন্য নয়, তারা যে মাটি কাটে (টপ সয়েল) তার শূন্য স্থান পূরণ করার জন্য। যে ওয়াগনে কয়লা আসে সেই ওয়াগনেই ছাই খনিতে ফেরৎ পাঠানোর কথা খনি ভরাটের জন্য। তবে ডি.ভি.সি. ছাড়া আর কেউই এই পদ্ধতি গ্রহণ করে না। মাটির তুলনায় শস্তা বলে অনেকেই নীচু জমি ভরাটের জন্য এই ছাইকেই সাদরে বরণ করেন।

ছাই থেকে ইট সমস্যা সমাধানের একটি উপায় : ছাই সমস্যার মোকাবিলার জন্য পশ্চিমবঙ্গ সরকার পিয়ারলেস কোম্পানীর সঙ্গে যৌথভাবে সেন্ট্রাল ফুয়েল রিসার্চ ল্যাবরেটরির প্রযুক্তির সহযোগিতায় বি.টি.পি.এস-এর পাশে পালভার অ্যাশ প্রজেক্ট লিমিটেড তৈরি করেন। সারা ভারতের মধ্যে পশ্চিমবঙ্গে পালভার অ্যাশ প্রজেক্টই একমাত্র দূষণ প্রতিরোধক কারখানা। তাপবিদ্যুৎ কেন্দ্রের ছাই সঙ্গে চুন, বালি ও অন্যান্য রাসায়নিক পদার্থ মিশিয়ে বিশে, তাপমাত্রায় 'ফ্লাই অ্যাশ ব্রিক' তৈরি করা হয়। ১৯৯৪ সাল থেকে এপর্যন্ত এখানে ৩ কোটি ইট তৈরি করে বিক্রি করা হয়েছে। বর্তমানে এই ইটের যথেষ্ট চাহিদা থাকলেও পালভার অ্যাশ প্রজেক্টে ইট তৈরি হচ্ছে না। সরকারী সংস্থা ডি.সি.পি.এল (ধানবাদ) ১২ লাখ ইট চেয়েও পাচ্ছেন না। ছাই থেকে পাওয়া ইটের অনেক সুবিধা— দাম কম, নোনা ধরে না, একই ধরনের আকৃতি, অন্যান্য মসলা কম লাগে, গুণগত মান অনেক বেশি, শক্তি (Tempor) প্রায় তিনগুণ বেশি, ভূমিকম্প সহ্য করার ক্ষমতা বেশি। শুধুমাত্র বাড়ি বানানোর সময় এই ইট গুলিকে ৮-১০ ঘণ্টা জলে ভিজিয়ে রাখতে হবে।

পরবর্তীকালে পরিকল্পনার অভাবে পালভার অ্যাশ কোম্পানীটি দূর্বল হতে শুরু করে। সরকারীভাবে সমস্ত রকমের ছাড় বন্ধ করে দেওয়া হয়, পাশাপাশি সরকারী স্তরে কোনরকম প্রচার হয়নি। এছাড়াও ইটভাটা মালিকদের প্ররোচনায় পালভার অ্যাশ-এর উৎপাদন বন্ধ করে দেওয়া হয়। অথচ বর্তমান অবস্থার সামান্য সংস্কার করেই উৎপাদন শুরু করা সম্ভব। এবিষয়ে রাজ্য সরকারের ক্ষুদ্র ও কুটিরশিল্প দপ্তর থেকে ৫০ লাখ টাকা মঞ্জুর করা হয়েছে। ইট তৈরি করে ছাই সমস্যা মেটানো যেতে পারে, পাশাপাশি দূষণ সমস্যাও কমবে। আরো একটি বিষয় উল্লেখ করা প্রয়োজন, ইট ভাটার দাপটে গ্রামের বিভিন্ন কৃষি জমিগুলি ব্যাপকভাবে নষ্ট হচ্ছে। এর ফলে কৃষিক্ষেত্রে ও পরিবেশ সংরক্ষণের ক্ষেত্রে এক ভয়াবহ বিপর্যয় নেমে আসবে।

তাপবিদ্যুৎ কেন্দ্রের ছাই সমস্যা সমাধানের অন্যতম পথ হল ছাই থেকে ইট তৈরি করা এবং ইটের প্রচলন বৃদ্ধি করা। এতে তাপবিদ্যুৎ কেন্দ্রের দূষণ সমস্যার অনেকটাই সমাধান হবে। পাশাপাশি কৃষিক্ষেত্রে দূষণ ও কমবে, পরিবেশের ভারসাম্যও বজায় থাকবে।

—নিজস্ব প্রতিবেদন

মুখস্ত বিদ্যা নয়। পরীক্ষা হলে ইংরাজী বানিয়ে লিখে ভাল ফল করুন।
ভর্তি চলিতেছে—IX - XII & Degree.
যোগাযোগ - T. PAUL
"কুসুম কুটীর", কাঁচরাপাড়া
পলিটেকনিক বয়েজ স্কুলের দক্ষিণে।
ফোন : ২৫৮৮-০৮২১

✆ ২৫৮৫-০৬৩৯
যে কোন অনুষ্ঠানের
ভিডিও ও স্টিল ছবির জন্য আসুন—
স্টুডিও ইউনিক
কে.জি.আর.পথ, কাঁচরাপাড়া
(লক্ষ্মী সিনেমা, এলাহাবাদ ব্যাঙ্কের পাশে)

বন্ধ জলাশয়

১ পাতার পর

এইসব ভরাট করলে পরিবেশ নষ্ট হয়ে যায় আর তা আইনবিরুদ্ধ। জেল অথবা জরিমানা হতে পারে। আমি গিয়ে ওদেরকে বললাম তোমরা এই পুকুরটা ভরাট করছ কেন? তার উত্তরে ওরা বলল এটা পুকুর কোথায় এটা তো নিচু জমি। আমি তো অবাক! এই পুকুরেই তো সাঁতার দিয়ে আমরা সাঁতার কাটা শিখেছি গরমকালে গামছা দিয়ে কত পুঁটি, মৌরলা, মাছ ধরেছি। আমাদের বাড়ির হাঁসগুলো এই পুকুরের গেঁড়ি গুগলি খেয়ে ডিম পেড়ে রেখে এসেছে পাড়ের জঙ্গলে। তা খুঁজতে গিয়ে ভোঁদড়ের (Fishing Cat) দেখা পেয়েছি। বর্ষাকালে পাড়ার সমস্ত জল ঐ পুকুরেই তো যায় এছাড়া ব্যাঙের মধুর ডাক ঐ পুকুর থেকেই তো আসে, রাতের বেলায় যখন বৃষ্টি নামে। একবার প্রচুর ব্যাঙাচি গামছা দিয়ে ধরে একটা কাঁচের শিশিতে রেখে দেখেছিলাম ব্যাঙাচি কিভাবে ব্যাঙ হয়। কিন্তু সব ব্যাঙাচির মৃত্যু ঘটেছিল তারা কেউই ব্যাঙ হয়নি। যাই হোক পুকুরের সাথে আমার ও আমাদের ছোটোবেলার যে স্মৃতি তা মাটি ফেলে শেষ করে ফেলবে দেখে প্রচণ্ড কষ্ট হল। যাঁরা এই পুকুর ভরাট প্রশাসনিকভাবে করতে পারেন তাঁদের কাছে বললাম, কিন্তু কোন ফল হল না। রাত দিন ধুলো উড়িয়ে বুক কাঁপিয়ে পুকুরটাকে বুজিয়ে ফেলা হল। পাড়ার কিছু পরিবেশ সচেতন মানুষ প্রতিবাদ করেছিলেন কিন্তু তাঁদের বোঝানো হল উন্নয়নকে ব্যাহত করে পরিবেশ রক্ষা করার কোনো মানে হয় না। যদি বেশি পরিবেশ পরিবেশ করতে হয় তো সুন্দরবনে গিয়ে বাস করুন। কিন্তু পাড়ার নিষ্কাশিত জল কোথায় যাবে? ওটা নিয়ে ভাবতে হবে না— ওটা অটোমেটিক গড়িয়ে গড়িয়ে গঙ্গায় চলে যাবে। তাতে তো মিষ্টি জল নোনা জলে পরিণত হয়ে সমুদ্রকে স্ফীত করবে এবং সমুদ্র উপকূলের জলস্তর বেড়ে যাবে। ততদিনে আপনি শেষ হয়ে যাবেন। আসলে এই আত্মসর্বস্ব জীবনে প্রতিটি মানুষ নিজেকে এবং নিজের পরিবারকে নিয়ে ভীষণ ব্যস্ত তাই পরিবেশ ভাবনা শুধু বইতেই থেকে যায়। জীবনের অহেতুক এই ব্যস্ততার (ইঁদুর দৌড়) শেষে যখন হিসেব মেলাতে যায় তখন সভ্যতা আঘাতপ্রাপ্ত। যাঁরা পুকুর ভরাট করেন তাঁরা একবারটিও ভাবেন না পুকুর ভরাটের ফলে জলস্তর নেমে যাবে ও তার পরবর্তী প্রজন্মের বেঁচে থাকবার কোন মানে থাকবে না। এই পত্রিকার যাঁরা প্রকৃত পাঠক অর্থাৎ বিদ্যালয়ের ছাত্রবন্ধুরা তোমরা পার এই পুকুর ভরাট রোধ করতে। একটা বোধ তৈরি কর তোমাদের বাড়ির বড়দের মধ্যে, যাঁরা এই পুকুর ভরাটের সঙ্গে যুক্ত। পুকুর ভরাট যেখানে হচ্ছে সেখানে হাত ধরে মানববন্ধন তৈরি করে যদি বল আমরা বাঁচতে চাই প্রকৃতিকে বাঁচাতে চাই তবেই বাঁচবে এই বসুধা। নইলে মানবসভ্যতা শেষ হয়ে যাবে খুব দ্রুত।

পুকুর ভরাট হয়ে যাবার সাতদিন পর একদিন রাতে কলকাতা থেকে বাড়িফিরছি, দেখি প্রচুর মানুষ পাড়ার মোড়ে দাঁড়িয়ে। জিজ্ঞাসা করলাম ব্যাপারটা কি? সবাই প্রায় সমস্বরে চিৎকার করে বলা শুরু করল আমার গোয়ালঘরে দুটো ভোঁদড় রয়েছে, গেলেই তাড়া করছে। একজন বলল একটা বড় কালো সাপ আমার শোবার ঘরে ঢুকে কোথায় রয়েছে বুঝতে পারছি না। কাল রাতে বৃষ্টির পর এক হাঁটু জল আমার বসার ঘরে ঢুকে সমস্ত আসবাব নষ্ট হয়ে গিয়েছে। এটা খুব স্বাভাবিক ঘটনা বলতেই, সবাই ক্ষেপে উঠল। গোয়ালঘর থেকে একটা ভোঁদড় বেরিয়ে এসে চিৎকার করে বলল তোরা মানুষেরা নিজেদের সভ্য, ভদ্র, নিরীহ বলিস। কিন্তু তোদের থেকে হিংস্র প্রাণী আর কে আছে? আমাদেব, সাপেদের, মাছেদের জায়গা দখল করে তোরা বসবাস করছিস। এখন আমরা কোথায় থাকব? একদিন আমাদের আক্রমণেই তোদের অস্তিত্ব বিপন্ন হবে। আমি অভিভূত হলাম ঐ ছোট্ট ভোঁদড়ের বক্তব্যে। ভোরের ঘুম আবারও ভেঙে গেল ঘড়ঘড় বুক কাঁপানো আওয়াজে। পুকুর ভরাট চলছে।

—বিবর্তন ভট্টাচার্য, বিজ্ঞানকর্মী
চাকদহ বিজ্ঞান ও সাংস্কৃতিক সংস্থা

পাখি : কাঠঠোকরা

১ পাতার পর

এদের লম্বা ঠোঁটের তিন থেকে চারগুণ বেশি; দ্বিতীয়টি হল এদের সামনের দিকে দুটি ও পেছনের দিকে দুটি এইভাবে পায়ের আঙুল সজ্জিত। পশ্চিমবঙ্গে আমরা প্রায় চার প্রকার কাঠঠোকরা দেখতে পাই সেগুলি হল— (অ) সোনালী পিঠ কাঠঠোকরা (Golden backed wood pecker); (আ) মারাঠা কাঠঠোকর (Yellow fronted pied/ Mahratta woodpecker) বিজ্ঞানসম্মত নাম *Picoides mahrattensis*); (ই) কালোপিঠ কাঠঠোকরা (Black backed wood-pecker) বিজ্ঞানসম্মত নাম *Chrysocolaptes festivus*; (ঈ) ক্ষুদে কাঠঠোকরা (Pigmy wood pecker) বিজ্ঞানসম্মত নাম *Picoides canicapillus*।

সোনালী পিঠ কাঠঠোকরা ও কালোপিঠ কাঠঠোকরার আকার শালিখ মাপের, উভয়েরই লম্বা শক্ত সোজা ও সূঁচালো ঠোঁট, লাল ঝুঁটি, কালচে শক্ত নিচের দিকে বাঁকানো লেজ, হলদে সোনালী ডানা, ডাকাডাকি মেঝেতে ধাতবের বড় চাকতি পতনে উৎপন্ন শব্দের মত। আবার পার্থক্যও আছে। প্রথমটির বুক কালো লম্বা ছিট্ ছিট্ দাগ যুক্ত, পিঠ সোনালী, স্ত্রী পাখির ঝুঁটি লাল; ডিম পাড়ে তিনটি কিন্তু দ্বিতীয়টির ক্ষেত্রে বুকের রঙ সাদাটে, ঘাড়ের নিচে কালো দাগ আছে, স্ত্রী পাখির মাথার ঝুঁটি হলুদ, ডিম পাড়ে মাত্র একটি। মারাঠা কাঠঠোকরা ও ক্ষুদে কাঠঠোকরার সারাদেহে কালো সাদা ফুটকি থাকে। প্রথমটি প্রায় বুলবুল মাপের, কপাল হালকা হলুদ রঙা, ঝুঁটি লাল হলুদ ছোপ রঙের। স্ত্রী পাখিদের ঝুঁটির রঙ থাকেনা, স্ত্রী-পুরুষ উভয়ের ঠোঁট লম্বা, পেট লাল ছোপ যুক্ত, হাঁক ডাক ক্লিক-ক্লিক ক্লিকররর ... শব্দের কিন্তু দ্বিতীয়টির ক্ষেত্রে দেহ চড়াই মাপের, কপাল ঘন খয়েরী রঙা, ঝুঁটি খয়েরী টুপীর মত, ঠোট ছোট্ট, হাঁক ডাক চির্‌ররর শব্দের। গ্রাম-শহরের বাড়ীর আশেপাশের নারকেল-তাল সুপারী গাছে, জঙ্গলের পাতাহীন বড় গাছের গুঁড়িতে, লেজের সাহায্যে ভর দিয়ে গাছের গুঁড়ি বরাবর গোল চক্রাকার পথে ওঠা নামা করে এবং মাঝে মধ্যে গা ঝাঁকিয়ে গুড়িতে জোরে ঠোক্কর মারে। এদের মাথার খুলি আঘাতরোধী ভাবে তৈরি তাই মাথার কোনো ক্ষতি হয় না। ঠোটের আঘাতে এরা পুরানো শক্ত বাকল উঠিয়ে দেয় এবং কাঠে ঘুন পোকাদের ছিদ্রগুলিতে লম্বা-কাঁটাওলা জিভ প্রবেশ করিয়ে ঘুনের লার্ভা, অন্য পোকামাকড়, পিঁপড়ে প্রভৃতি খাবার সংগ্রহ করে এবং গিলে নেয়। সব জাতের কাঠঠোকরা ওড়ার সময় প্রথমে দু-তিনবার ডানা কাঁপিয়ে কিছুক্ষণ ডানা বন্ধ রাখে আবার ডানা ঝাপটায়। গাছের মাঝামাঝি উচ্চতায় পচা নরম কাঠ খুঁড়ে গর্ত করে প্রবেশপথ একটু ঢালু রাখে। স্ত্রী পাখি উজ্জ্বল সাদা প্রায় গোলাকার তিন থেকে চারটি ডিম পাড়ে। স্ত্রী-পুরুষ উভয় পাখি ডিমে তা দেয় এবং বাচ্চাদের খাইয়ে বড় করে। কাঠঠোকরা গাছের বন্ধু পাখি। ব্যাপক হারে গাছ কাটার ফলে এরা সংখ্যায় কমে এসেছে।

কাঠঠোকরা

—পার্থ বন্দ্যোপাধ্যায়, ত্রিবেণী যুক্তিবাদী সংস্থা

ফোন : ২৬৮৪-৫৫৫৪

জলাতঙ্ক আর এক নাম মৃত্যু

ছোটবেলায় পড়া একটা ছড়া মনে পড়ে 'কুকুরের কাজ কুকুর করেছে, কামড় দিয়েছে পায়ে, তাই বলে কি কুকুরের কাজ মানুষে শোভা পায়?'— না পায় না। তাই কুকুরে কেন কামড়ায় বা কখন কামড়ায় সেটাও যেমন দেখবো, তেমন দেখবো ঐ সময় মানুষের কি কাজ। কুকুর বা অন্যান্য উষ্ণ রক্তের প্রাণীরা যখন র‍্যাবডো ভাইরাসে সংক্রামিত হয় তখন তারা দুধরণের আচরণ করে। তাদের মধ্যে উন্মত্ততা দেখা যায় অথবা মূক লক্ষণ দেখা যায়। উন্মত্ত লক্ষণের কুকুরদের মধ্যে দেখা যায় অস্বাভাবিক ভাবভঙ্গি, বিকৃত ক্ষুধার লক্ষণ। বিনা প্ররোচনায় সামনে যাকে পায় তাকেই কামড়ায়। অস্বাভাবিক স্বরে ডাকে। শরীরে মৃদু কাঁপুনি থাকে। মুখ দিয়ে লালা বেরোতে থাকে। পরে তার চোয়াল ও পায়ে পক্ষাঘাত হয়। ডাক বন্ধ হয়ে যায়। চলতে পারে না। শেষে নিঃশ্বাসের কষ্ট হয়। দশ দিনের মধ্যে মারা যায়। মূক লক্ষণের কুকুরগুলি চুপচাপ ঝিমিয়ে থাকে। অন্ধকার কোনে বসে থাকতে চায়। খেতে চায় না। এই সব কুকুরগুলিকে অসুস্থ ভেবে খাওয়াতে গিয়ে হয় বিপত্তি। তাদের লালা ক্ষতস্থানে লেগে মানুষের সংক্রমণের সম্ভাবনা থেকে যায়।

এই দুই ধরনের আচরণের কুকুরদেরই লালা থেকে (সে কামড়েই হোক বা পড়ে থাকা লালা ক্ষতস্থানে লেগে হোক) লালায় থাকা ভাইরাসগুলি মানুষের বা অন্যান্য প্রাণীর দেহে সংক্রামিত হয়। এরপর স্নায়ুপথ ধরে এই ভাইরাসগুলি স্পাইনাল কর্ড হয়ে মস্তিষ্কে বাসা বাঁধে। এরফলে তখন জলাতঙ্কের লক্ষণগুলি দেখা যায়। শুরুর প্রথম ২-৩ দিনের মধ্যে গা ম্যাজ ম্যাজ করে, মাথা ব্যাথা, অবসাদ, বমিভাব, খিদের অভাব, জ্বর ইত্যাদি লক্ষণের সাথে বেশিরভাগ ক্ষেত্রে কামড়ানোর জায়গায় ব্যথা করে, ঝিনঝিন করে। এরপর স্নায়ুতন্ত্র উত্তেজিত হবার ফলে রোগী শব্দ, আলো, ঠাণ্ডা বাতাস সহ্য করতে পারে না। রোগের তীব্রতা বাড়তে থাকে। গলার মাংস পেশীর সংকোচনের ফলে রোগী তরল পদার্থ গিলতে পারে না। তাই তখন যদি জল বা অন্য কোন তরল পদার্থ রোগীর সামনে আনা হয় তখন দুঃসহ অভিজ্ঞতার স্মৃতিতে রোগীর আতঙ্ক ভীষণভাবে প্রকাশ পায়— তেষ্টা পেলেও সে তখন খেতে পারে না। খিঁচ ধরা পেশীর জন্য সে বিকৃত চিৎকার করে। জল দেখে মাংস পেশীর তীব্র সংকোচন হয়। শুরু হয় তীব্র খিঁচুনি, পক্ষাঘাত শুরু হয়, হাঁপাতে থাকে। সাধারণত আক্রান্ত হওয়ার দশদিনের মধ্যে মৃত্যু হয়।

জলাতঙ্কের ভাইরাস বহনকারী প্রাণীর কামড়ের মাধ্যমে শরীরে ভাইরাস ঢোকার পর ধীরে ধীরে ছড়ায়। মানুষের ক্ষেত্রে রোগের লক্ষণ প্রকাশ পেতে বেশ কিছুটা সময় লাগে।

জলাতঙ্ক প্রতিরোধে দরকার প্রথমে কামড়ের জায়গায় চিকিৎসা। বেশি ক্ষার যুক্ত সাবান ও জল দিয়ে ক্ষতস্থান ধুয়ে ফেলতে হবে। কলের নিচে ক্ষতস্থান রেখে ধুতে পারলে ভালো। সাধারণত জন্তুর কামড়ের ক্ষত ড্রেসিং বা ব্যান্ডেজ করা হলে সংক্রমণের সম্ভাবনা বৃদ্ধি পায়। কাটা জায়গায় ডেটল বা অ্যালকোহল দেওয়া দরকার। এর পর দেরী না করে অবশ্যই জলাতঙ্কের টীকা নেওয়া দরকার। কারণ জলাতঙ্কের ভাইরাস শরীরে, স্নায়ুতে ঢুকলে রোগীকে আর বাঁচানো সম্ভব নয়। যেহেতু এ পর্যন্ত এই রোগে আক্রান্ত হলে সারাবার কোনো ওষুধ নেই।

এই টীকা মানুষের কোষ থেকে তৈরি হয় আবার জীবজন্তুর কোষ থেকেও তৈরি হয়। জীবজন্তুর মধ্যে আবার মুরগীর ভ্রূণ থেকে তৈরি হয়, হাঁসের ভ্রূণ থেকে ভেড়ার মস্তিস্ক থেকে, ঘোড়ার রক্তরস থেকে তৈরি হয়। এর মধ্যে মানুষের রক্তরস থেকে তৈরি ভ্যাকসিন সবচেয়ে ভালো এবং নিরাপদ কিন্তু ব্যয়বহুল। তাই জীবজন্তুর কোষ থেকে তৈরি ভ্যাকসিনই হাসপাতালগুলিতে চলে। মুরগীর ভ্রূণ থেকে তৈরি পিউরিফায়েড চিক-এমব্রায়োসেল ভ্যাকসিন (P.C.E.C.V.) হাতে ছয়টি ইনজেকশন দিয়ে নিতে হয়। এতে এলার্জি সৃষ্টির প্রোটিন থাকলেও এলার্জির সম্ভাবনা কম। খরগোশ ও ভেড়ার মস্তিষ্ক থেকে তৈরি নার্ভ টিস্যু ভ্যাকসিন (N.T.V.) ১৪টি প্রতিদিন পেটের চামড়ার নিচে নেওয়া হয়। এই ভ্যাকসিনের মারাত্মক অসুবিধা হলো ভ্যাকসিনের মধ্যে ভেড়ার মস্তিষ্কের টিস্যুর অংশ থেকে যেতে পারে তার প্রভাবে পক্ষাঘাত বা অন্য গুরুতর রোগ হতে পারে। দেখা গেছে পক্ষাঘাতে আক্রান্ত ব্যাক্তির সংখ্যা এক হাজারে একজন। সমস্ত সরকারি হাসপাতালগুলিতে এই ভ্যাকসিন বিনামূল্যে দেওয়া হয়। এবং ৬ মাসের মধ্যে ব্যবহার করতে হয়। মানুষের কোষ থেকে তৈরি হিউম্যান ডিপ্লয়েড সেল ভ্যাকসিন (H.D.C.V.) হাতে ছয়টি ইনজেকশনের মাধ্যমে নেওয়া হয়।

সরকারী হাসপাতালগুলিতে N.T.V. প্রয়োজনের তুলনায় সরবরাহ এত কম তাই অসুবিধায় পড়েন প্রান্তিক মানুষেরা। শিক্ষার অভাবে সঠিক তথ্য জানা হয় না এবং অর্থও এক অন্তরায় হয়ে দাঁড়ায়। এর ফলে তাঁরা সহজেই থালা পড়া, গুড় পোড়া, কলা পোড়া, জল পড়া প্রভৃতি সস্তার অবৈজ্ঞানিক টোটকা পদ্ধতিকে আশ্রয় করেন। কিছু মানুষ এতে বেঁচে যান। কারণ, কারণ কুকুরে কামড়ালেই র‍্যাবডো ভাইরাসের সংক্রমণ ঘটেনা। রেবিজ আক্রান্ত পশুর কামড়েই জলাতঙ্ক হয়। জলাতঙ্ক হওয়ার আগে অর্থাৎ রেবিজ ভাইরাস স্নায়ুতে প্রবেশের আগে টীকা নেওয়া জরুরী। নতুবা সংক্রমণ হলে অবধারিত মৃত্যু।

১৪টি N.T.V. নেওয়া ঝুঁকিপূর্ণ ও কষ্টকর। তাই কোষ থেকে তৈরি H.D.C.V. আমাদের দেশে তৈরি করতে বাধ্য করা দরকার। বিজ্ঞানীদের অভিযোগ সর্বাধুনিক ভ্যাকসিন তৈরির ক্ষেত্রে কোনও সময়েই তাদের সুপারিশ গ্রাহ্য করা হয়নি। স্বাস্থ্য ও প্রাণী সম্পদ দফতর উন্নত পরিকাঠামো গড়ার ব্যাপারে কখনও সদিচ্ছা দেখায়নি। ফলে অসংখ্য সাধারণ মানুষকে ঠেলে দেওয়া হচ্ছে অনিশ্চিত ভবিষ্যতের দিকে বা নিশ্চিত মৃত্যুর দিকে।

—মহাদেব মল্লিক

প্লুটোর ওপারে

১ পাতার পর

যায় যে সৌরজগতের বিস্তৃতি প্লুটো পর্যন্ত নয়। নয়টি গ্রহ, ধূমকেতু ও উল্কাই শুধু সূর্যের বন্দী নয়। সূর্যের মহাকর্ষের জালে বন্দী আরও অনেক মহাজাগতির বস্তু।

বুধ, শুক্র, মঙ্গল, বৃহস্পতি—এই চারটি গ্রহ কবে, কোথায় কে, কিভাবে আবিষ্কার করেছেন তার সঠিক হদিশ এখনও পাওয়া যায়নি। দূরবিন যন্ত্র ও বিজ্ঞানী নিউটনের মহাকর্ষ বল সংক্রান্ত সূত্র আবিষ্কারের পর শনির পরে অবস্থিত সৌরজগতের নতুন নতুন গ্রহের অস্তিত্ব ধরা পড়ে। তখন থেকেই বিজ্ঞানীদের মনে সৌরজগতের ব্যাসার্ধ সম্পর্কে প্রশ্ন জাগে। ১৭৮১ সালে উইলিয়াম হার্সেল ইউরেনাস আবিষ্কার করেন। ১৮৪৬ সালে বিজ্ঞানী লেভেরিয়ের দূরবিনে ধরা পড়ে নেপচুন। তারপর ১৯৩০ সালে প্লুটোর সন্ধান পেলেন বিজ্ঞানী টমবাও। কোথায় শেষ তাহলে সৌরজগতের। এটা জানার দুর্দম কৌতুহল মেটাতে বিজ্ঞানীরা পৃথিবীতে বসেই পাড়ি দিলেন প্লুটোর ওপারে।

ধূমকেতুর উৎস সন্ধান করতে করতেও বিজ্ঞানীরা প্লুটোর ওপারে যেতে বাধ্য হন। 'প্লুটোর পরে সৌরজগতের সীমানার মধ্যে কি আছে আর ধূমকেতুর উৎপত্তিস্থল কোথায়'—এই দুই প্রশ্নের উত্তর দেন ১৯৫০ সালে বিজ্ঞানী হেন্ড্রিক উয়োর্ট। যদিও কুড়ি বছর আগে প্রায় একই রকম তথ্য পেশ করেছিলেন আর এক বিজ্ঞানী। এই তত্ত্ব অনুসারে, সূর্যকে কেন্দ্র করে ৩০ ট্রিলিয়ন কিলোমিটার ব্যাসার্ধের যে গোলক কল্পনা করা হয়েছে তার ভিতরের তলে রয়েছে বরফের জমাট বাধা মেঘ। এই মেঘ রয়েছে প্লুটোরও পরে অবস্থিত। এর নাম 'উর্টের মেঘ'। এখানে রয়েছে বরফের তৈরি কোটি কোটি বস্তু খণ্ড। এই অঞ্চলটি এতই শীতল যে বিভিন্ন রকমের গ্যাস এই অঞ্চলে জমাট বেঁধে বরফের মেঘ তৈরি করেছে। উর্টের মেঘের দুটি অংশ। ভিতরের অংশটি প্রায় চাকতির মত। এর নাম কুইপার বেল্ট (Kuiper Belt)। বাইরের অংশটি সূর্য ও তার গ্রহদের ঘিরে রেখেছে। কুইপার বেল্ট শুরু হয়েছে প্লুটোর কক্ষপথের ভিতর থেকে এবং শেষ হয়েছে সৌরজগতের সীমানায়।

এখন প্রশ্ন উঠতে পারে 'উর্টের মেঘ' তৈরি হল কিভাবে? এই প্রশ্নের উত্তর পেতে হলে আমাদের এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের সৃষ্টির ইতিহাসের দিকে তাকাতে হবে। আমাদের এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ড তৈরি হয় আজ থেকে প্রায় ২০ বিলিয়ন বছর আগে (১বিলিয়ন = ১০০ কোটি)। তখন গ্রহ নক্ষত্র বা অন্যান্য জ্যোতিষ্ক কিছুই তৈরি হয়নি। সারা বিশ্বব্রহ্মাণ্ড জুড়ে ছিল শুধু গ্যাসীয় মেঘ। এই গ্যাস ছিল প্রচণ্ড বেগে ঘূর্ণায়মান। বিশ্বসৃষ্টির বহুকোটি বছর পর, আজ থেকে প্রায় ৫০০ কোটি বছর আগে এই ঘূর্ণায়মান গ্যাসেরই কোন এক ঘন অংশে তৈরি হয়েছিল সূর্য। তারপর গ্রহরা। সূর্য থেকে যত দূরে পাওয়া যায় ততই তাপমাত্রা কমতে থাকে। প্লুটোর পরবর্তী স্থানে পূর্বল্লিখিত গ্যাসের অবশিষ্ট অংশ অত্যন্ত শৈত্যের ফলে জমাট বেঁধে উর্টের মেঘ তৈরি করেছে। সূর্যের মহাকর্ষের টানে এই গ্যাসের বরফও সূর্যের চারিদিকে ঘুরছে গ্রহদের মত। এই অংশেই উৎপন্ন হয় ধূমকেতু।

এই উর্টের মেঘ ও কুইপার বেল্ট অঞ্চলে এ পর্যন্ত ৪০০ টিরও বেশি বস্তুকে সনাক্ত করা গেছে। ২০০২, ২০০১ ও ২০০০ সালে যথাক্রমে কুয়োয়ার (Quoar), ইক্সিওন (Ixion) ভ্যারুনা (Varuna) কুইপার বেল্ট অঞ্চলে আবিষ্কৃত হয়েছে। প্লুটোর পরের যেকোন বস্তুকেই বিজ্ঞানীরা কুইপার বেল্ট অবজেক্ট বলেন। এমনকি গ্রহ হিসাবে প্লুটোর বৈশিষ্ট্যে কিছু ব্যাতিক্রম থাকায় বিজ্ঞানীদের একাংশ প্লুটোকেও গ্রহ না বলে কুইপার বেল্ট অবজেক্ট বলে মনে করেন। ২০০৪ সালে আমেরিকার বিজ্ঞানী সৌরজগতের আর এক সদস্যের সন্ধান পান কুইপার বেল্ট অঞ্চলে। গ্রহদের সঙ্গে বেশ কিছু সাদৃশ্য থাকায় একে কেউ কেউ গ্রহ বলছেন। এই নতুন সদস্যটির নাম রাখা হয়েছে সেডনা (Sedna)। সূর্য থেকে এর দূরত্ব ৫.৯ বিলিয়ন কিমি। এটি সূর্যকে একবার প্রদক্ষিণ করতে সময় নেয় ১০,৫০০ বছর। এর ব্যাসার্ধ প্লুটোর অর্ধেক। বর্তমানে সেডনা সৌরজগতের দূরতম বস্তু। বিজ্ঞানী ডানকান স্টীল (Dunkan Stell) জানিয়েছেন প্লুটোর পরের সমস্ত বস্তুই বরফ ও পাথরের তৈরি বিশালাকৃতি ধূমকেতু ছাড়া কিছুই নয়। সূর্য থেকে বহু দূরে থাকায় এদের কোন লেজ তৈরি হয়নি। যাইহোক উর্টের মেঘ ও কুইপার বেল্ট অঞ্চলে আগামী দিনের জন্য আরও রহস্য ও বিস্ময় লুকিয়ে রয়েছে। বিজ্ঞানীদের একনিষ্ঠ প্রচেষ্টা, পর্যবেক্ষণ একটু একটু করে এইসব রহস্যের সমাধানকে আমাদের কাছে পৌঁছে দেবে।

—কাকলি সরকার

গুপ্ত ঘাতককে ঘরে আর নয়

লেখার প্রারম্ভে একটা কথা জানাতে চাই যে, 'চকচক করলেই সোনা হয়না।' আমরা বিশেষ করে মধ্যবিত্তরা যখন কোন বাজারী পণ্য কিনি তখন এইসব জিনিসগুলোর গুণগত মান যাচাই না করে শুধুমাত্র সুবিধাগত দিকগুলি দেখে কিনি। তাও আবার দোকানদারদের কথায়।

কিন্তু সাবধান 'গুপ্ত ঘাতক' থেকে। প্রযুক্তিগত আধুনিক সামগ্রীগুলো যেমন— টি.ভি., জেরক্স, নেলপালিশ রিমুভার, রেফ্রিজারেটর, মাইক্রোওয়েভ ওভেন এই সকল স্টেটাস-ওয়ালা দ্রব্যগুলি থেকে অনবরত তেজস্ক্রিয় বিকিরণ নির্গত হয় যা থেকে গা বমি-বমি, খিদে মরে যাওয়া, মাথা ধরা, চোখ জ্বালা করা ইত্যাদি হয়ে থাকে। এই তেজস্ক্রিয়তা দেহে সৃষ্টি করতে পারে ক্যানসার বা লিউকোমিয়ার মতন মারণ ব্যাধি। পূর্বোক্ত দ্রব্যগুলির তেজস্ক্রিয়তার বিষ চোখে দেখা যায়না, স্বাদে, গন্ধে বা অনুভূতিতে ধরা যায় না অথচ আমাদের ঘরের আবহাওয়ায় দূষণ এনে দিচ্ছে যা অচিরেই আমাদের স্বাস্থ্যহীনতার দিকে ঠেলে দিচ্ছে। বেশি ও ভয়াবহ ক্ষতি হয় নারী ও শিশুদের।

কাজেই আমরা যেন টাকা দিয়ে জেনেশুনে বিষপান করে আমাদের এই অবক্ষয়ী সমাজে কুলিন হওয়ার চেষ্টা না করি। বিশেষ করে নেলপালিশ রিমুভার ব্যাবহার থেকে সাবধান থাকা উচিৎ। আমাদের দেশের ক্রেতাদের প্রসাধন সামগ্রীর ব্যবহারের ভয়ানক দিকটার কথা বলা হয়না। বিদেশে সামান্য হলেও এই পদ্ধতি রয়েছে। আর এই সুযোগে ব্যবসা চলছে দুনিয়া কাঁপানো প্রসাধন নির্মাতাদের।

পরিশেষে বলি, প্রযুক্তির ভাল বা মন্দ দিকগুলো যাচাই না করে গুপ্ত ঘাতকদের ঘরে এনে আমরা যেন ঘরের পরিবেশে দূষণ না ছড়াই। এই দ্রব্যগুলো ভয়ানক, স্বাস্থ্যের পক্ষে বিপদজনক। এখনই সতর্ক হতে হবে নইলে ভবিষ্যতে শোধরাবার আর উপায় থাকবেনা—মৃত্যু অবশ্যম্ভাবী।

কৃতজ্ঞতা স্বীকার: প্রতিদিন, ৪-৭-৯৮

—প্রতুল কুমার দাস (বিজ্ঞান কর্মী)

অলৌকিক নয় বিজ্ঞান

১ পাতার পর

দেখা যায়। কারণ মাকে বেছে নেওয়া হল তার মন কুসংস্কারে আচ্ছন্ন থাকে ফলে তাদেরকে যা বিশ্বাস করানো যাবে তারা সেইভাবে চালিত হবে। গুণিন ঐ মহিলা বা কিশোরী বা মানসিকভাবে দুর্বল পুরুষের বুড়ো আঙ্গুলে নারকেল তেল ও সিঁদুর মাখিয়ে দেয়। আর বলে চোরের দেহের আকৃতি কিভাবে চুরি করছে, জিনিসপত্র নিয়ে যাচ্ছে ইত্যাদি সমস্ত ঘটনাগুলো ছবির মতো মন্ত্রপূত তেল সিঁদুর লাগানো নখে দেখা যাবে। তখন ঐ মহিলা বা কিশোরী বা পুরুষ গুণিনের সাথে সন্দেহভাজন ব্যক্তিদের নাম পর্যায়ক্রমে বলতে থাকে। একসময় তার মস্তিষ্কের সূক্ষ্ম নার্ভকোষগুলির মধ্যে চোর এবং চুরি হওয়া জিনিস সম্পর্কে একটা ধারণার সৃষ্টি হতে থাকে। তার মনের মধ্যে একটা দ্বন্দ্ব ক্রিয়া করে এই বুঝি তার নখে চোরের ছবি ভেসে উঠলো। সাময়িকভাবে সে তখন ভারসাম্য হারিয়ে দৃষ্টিভ্রমের বশে তার সন্দেহভাজন কোন এক ব্যক্তির অস্পষ্ট ছবি দেখতে পাচ্ছে বলে চিৎকার করে ওঠে। আসলে তখন তার মনে মিথ্যা বিশ্বাস, তাছাড়া একভাবে দীর্ঘক্ষণ ধরে একদৃষ্টিতে নখের দিকে চেয়ে থাকায় অথবা চারপাশে জমা দর্শক সাধারণের বিকৃত ছায়া কিংবা তার নিজেরই ঝুঁকে পড়া মাথার ছবিটা তেল সিঁদুর মাখানো চকচকে নখে (যেটা উত্তল লেন্স বা আয়নার কাজ করে) দৃষ্টিভ্রম ঘটায়।

—শুভঙ্কর ঘোষ (বিজ্ঞানকর্মী)

জলদূষণ ও জলবাহিত রোগ সমাধান কোন পথে?

১৯৭৮ সালের মে মাসে জেনেভা শহরে বিশ্বস্বাস্থ্য সংস্থার উদ্যোগে ভারত সহ সদস্য দেশগুলি '২০০০ সালের মধ্যে সকলের জন্য নিরাপদ জল পৌঁছে দেওয়া'— এই অঙ্গীকারপত্রে সই করেছিল। এখনো সকলের জন্য নিরাপদ প্রয়োজনীয় পানীয় জলের ব্যবস্থা পুরোপুরি সফল হয়নি। পানীয় জল নষ্ট হচ্ছে, জলদূষণ বাড়ছে, দূষিত জলের ব্যবহারে স্বাস্থ্যের ক্ষতি হচ্ছে, জলবাহিত রোগ বাড়ছে।

শিল্প কারখানা থেকে নির্গত ক্ষতিকর রাসায়নিক পদার্থগুলি নদী খালবিলের মাধ্যমে জলাশয়ে মিশছে। তাপবিদ্যুৎ কেন্দ্র থেকে উষ্ণ জল নদীতে মিশছে। ফলে ঐ অঞ্চলের প্রাকৃতিক ভারসাম্য নষ্ট হচ্ছে। জলাশয়ে মাছের উৎপাদন ব্যাহত হচ্ছে। ক্রোমিয়াম, নিকেল, সীসা, নাইট্রেট, পেট্রোলিয়াম সহ বিভিন্ন রাসায়নিক পদার্থ মিশে জল দূষিত হচ্ছে। সমীক্ষায় জানা গেছে গঙ্গানদীতে প্রতিদিন ৩২ কোটি লিটার নোংরা জল, ৬০ লক্ষ টন রাসায়নিক সার, ৯ হাজার টন কীটনাশক পড়ছে।

দূষিত জলের ব্যবহারে স্বাস্থ্যের ক্ষতি : দূষিত জল ব্যবহারের ফলে প্রতিবছর কয়েক লক্ষ মানুষ ও গবাদি প্রাণী অসুস্থ হয়ে পড়ছে। ডায়ারিয়া, গ্যাসট্রো-এন্টারিটিস, ডিসেন্ট্রি, আমাশয়, কলেরা, এন্টারিক ফিভার, জিয়ারডিয়াসিস, কৃমি সংক্রমণ, গিনি ওয়ার্ম, হেপাটাইটিস-এ ও ই, পোলিওমাইলেটিস, চর্মরোগ, ফ্লুরোসিস, আর্সেনোকোসিস প্রভৃতি রোগে প্রতিবছরই কয়েকলক্ষ লোক মারা যায়।

জলবাহিত রোগ বেড়েই চলেছে : ১) জীবাণুযুক্ত জল ও খাবারের সঙ্গে

এরপর ৭ পাতায়

যারা হারিয়ে যাচ্ছে

(এই বিভাগে নিয়মিত ভাবে থাকবে লুপ্তপ্রায় প্রাণীদের কথা)

অলিভ রিড্‌লে কচ্ছপ : ভারতবর্ষের উপকূলে যে পাঁচধরনের সামুদ্রিক কচ্ছপ দেখতে পাওয়া যায় তাদের মধ্যে অলিভ রিডলে (বিজ্ঞানসম্মত নাম *Lepidochelys olivacea*) অন্যতম। ডিম পাড়ার জন্য এই কচ্ছপরা উপকূলের কাছাকাছি আসে। উড়িষ্যা উপকূলে ডিম পাড়ার জন্য রাত্রে অলিভ রিড্‌লে কচ্ছপরা দলে দলে পাড়ে উঠে আসে। এই ঘটনাকে বলা হয় aaribaba (স্পেনিশে এর অর্থ দলবদ্ধ আগমন)। উড়িষ্যা উপকূলের তিনটি যায়গায় এরা ডিমপাড়ে। সমুদ্র থেকে উঠে আসার সময় এদের পিঠের শক্ত খেলা যা 'ক্যারাপেস' নামে পরিচিত,

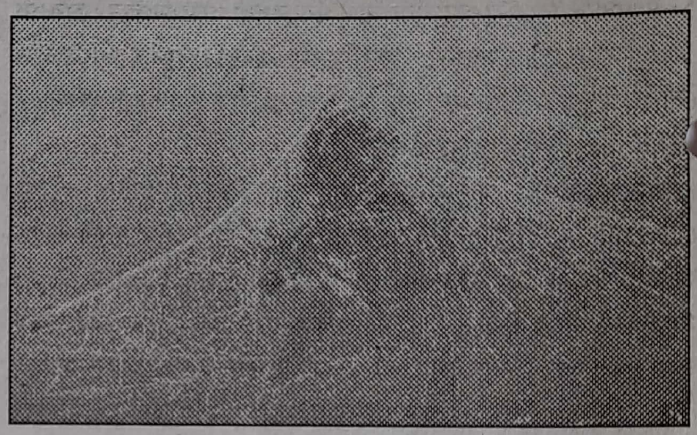

জ্বলজ্বল করে। রাত্রে এদের দলবদ্ধ আগমন দেখতে পাওয়া এক বিরল দৃশ্য। উড়িষ্যা ছাড়াও কোস্টারিকা এবং মেক্সিকোর সমুদ্র তীরে এরা ডিমপাড়ে। এই সময় প্রায় ছয় মাস ধরে এরা উপকূলে অবস্থান করে। এই সময় মাছ ধরার জালে এরা আটকে পড়ে এবং বাতাস নেওয়ার জন্য ওপরে আসতে পারে না বলে মারা যায়। কচ্ছপগুলি রাতারাতি সমুদ্রতীরের বালি খুঁড়ে বাসা তৈরি করে ডিম পাড়ে তারপর ডিমগুলি বালি দিয়ে ঢেকে দেয়। প্রায় দুইমাস বাদে ডিম ফুটে ছানা কচ্ছপ জন্ম নেয়। ছানা কচ্ছপরা দিগন্তের হালকা আলোর আভাসকে লক্ষ্য করে চলতে চলতে জলের ধারে পৌঁছে যায় তারপর অবিরাম সাঁতার কেটে উপকূল অঞ্চল ছাড়িয়ে গভীর সমুদ্রে পৌঁছে যায়। সমুদ্র তীর থেকে উপকূল অঞ্চলের মধ্যেই নানারকম প্রাণীরা এদের উপাদেয় সহজলভ্য খাবার হিসাবে গ্রহণ করে। এত বিপদ অতিক্রম করে এদের বাঁচতে হয় বলে গড়ে ১০০০ টা ছানার মধ্যে ১টি ছানা বেঁচে থাকে। অলিভ রিড্‌লে আজ অন্যতম লুপ্তপ্রায় প্রাণী। এদের বিপদ আরো বেড়ে গেছে মূল ভূখণ্ডের দিকে কলকারখানার, জনপদের জোরালো আলোর উপস্থিতিতে। ছানা কচ্ছপরা দিগন্তের হাল্কা আলোর থেকে জোরালো এই আলোর দিকে আকৃষ্ট হয়ে মূল ভূখণ্ডের দিকে অর্থাৎ জলের বিপরীত দিকে এগোতে থাকে এবং মারা যায়। ভবিষ্যতে হয়ত এদের arribaba আর দেখা যাবে না।

✆ ২৫৮৫-৬০৯৪
বিজলী
পেপার এন্ড ষ্টেশনার্স
কে.জি.আর.পথ, (লক্ষ্মী সিনেমার বিপরীতে) কাঁচরাপাড়া, উত্তর ২৪ পরগনা

জলাভূমি প্রকৃতির কিডনি, একে বাঁচান।

বিজ্ঞান অন্বেষক এর গ্রাহক হোন

বিজ্ঞান মনস্কতা গড়ে তুলতে আমাদের পাশে থাকুন। মতামত ও পরামর্শ অবশ্যই পাঠাবেন।

জলদূষণ

৬ পাতার পর

রোগ ছড়ায়। ২) জীবাণুর 'সিস্ট' জল ও খাবারের মধ্যে দিয়ে মানুষের অন্ত্রে প্রবেশ করে। ৩) জীবাণুযুক্ত খাবার, মাছি, পায়খানা ও প্রস্রাবের সঙ্গে 'এন্টারিক ফিভার' ছড়ায়। ৪) জলে নানা ধরণের কৃমি সংক্রমণও ঘটে।

জলে ক্ষতিকর রাসায়নিক পদার্থের আধিক্যজনিত রোগ ও সহনশীল মাত্রা — (ক) ক্রোমিয়াম : চর্মরোগ, ক্যানসার। সহনশীলমাত্রা .০৫ মিগ্রা/লিঃ (খ) আর্সেনিকঃ মেলানোসিস, কেরাটোসিস, ক্যানসার, অঙ্গহানি ও রক্তশূন্যতা। বিশ্বস্বাস্থ্য সংস্থার মতে নিরাপদ মাত্রা ০.০১ মিগ্রা/লিঃ। (গ) লোহাঃ অম্বল কোষ্ঠবদ্ধতা। (ঘ) অভ্রঃ পাতলা পায়খানা। (ঙ) ফ্লুরাইডঃ দাঁত ও হাড়ের রোগ, ফ্লুরোসিস। সহনশীল মাত্রা ০.০১ মিগ্রা/লিঃ। (চ) মিথাইল ক্লোরাইড : বোতলের জলে কোন এক্সপায়ারি ডেট থাকেনা। দীর্ঘদিন বোতলে জল ভর্তি থাকলে ব্যাকটিরিয়া মারাত্মক বৃদ্ধি পেতে পারে। খারাপ প্লাস্টিক বোতল থেকে মিথাইল ক্লোরাইড-এর মত বিষ জলে মিশতে পারে। ফলে নানা রোগ হতে পারে। (ছ) ক্লোরিনঃ জলে বেশিমাত্রায় ক্লোরিন শরীরের পক্ষে ক্ষতিকারক।

জলদূষণ ও জলবাহিত রোগ-এর সমস্যা সমাধানের উপায় — ১) প্রতিটি কলকারখানায় দূষণ নিরোধক ব্যবস্থা কার্যকরী করতে হবে। ২) কৃষিক্ষেত্রে রাসায়নিক সার ও কীটনাশকের পরিবর্তে জৈবসারের ব্যবহার, জৈবনিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। ৩) পরিশ্রুত পানীয় জল, খাবার ঢেকে রাখতে হবে ও সাধারণ স্বাস্থ্যবিধি সবাইকে মেনে চলতে হবে। ৪) জলের বিভিন্ন উৎসগুলিকে নির্দিষ্টভাবে ব্যবহারের জন্য সামগ্রিকভাবে পরিকল্পনা করতে হবে। ৫) আর্সেনিক প্রবণ এলাকায় ভূগর্ভস্থ জল তোলা বন্ধ করতে হবে, পাশাপাশি ভূপৃষ্ঠস্থ জলের ব্যবহার বৃদ্ধি করতে হবে। ৬) জলাশয় সংরক্ষণ, পুকুরের ও জলাশয়ের ভারসাম্য রক্ষার জন্য জলাশয়ে ব্যাঙ, কাঁকড়া, শামুক, জলঢোড়া সাপ সহ নানাধণের শেওলা চাষ করতে হবে। ৭) বৃষ্টির জলকে ধরে রাখার জন্য নদী বা জলাশয়ের গভীরতা বৃদ্ধি করতে হবে।

বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার এক আর্থিক সমীক্ষায় জানা যায় ৫ বছরে জলবাহিত রোগ যতটা আর্থিক ক্ষতি করে সেই টাকায় সকলের জন্য নিরাপদ পানীয় জল পৌঁছে দেওয়া যায়।

—জয়দেব দে।

শতাব্দীর বিরল ঘটনা দেখার জন্য পর্যবেক্ষণ শিবির

আগামী ৮ জুন ২০০৪ সৌরজগতে ঘটবে এই শতাব্দীর এক বিরল ঘটনা। শুক্র গ্রহ পৃথিবী ও সূর্যের মাঝখানে অবস্থান করবে এবং আমাদের অঞ্চল থেকে শুক্রকে কিছু সময় ধরে সূর্যের গায়ে এক কালো বিন্দুর মত দেখা যাবে। এই ঘটনাকে বলা হচ্ছে সূর্যের শুক্র গ্রহ সংক্রমণ। ঘটনাটি নিজের চোখে দেখার জন্য ৮ জুন, সকাল সাড়ে দশটা থেকে কাঁচরাপাড়া বিজ্ঞান দরবার এক পর্যবেক্ষণ শিবিরের আয়োজন করেছে কাঁচরাপাড়া হাইস্কুল মাঠে। দূরবিন, বিশেষ চশমার সাহায্যে এই ঘটনা পর্যবেক্ষণ শিবির থেকে দেখা যাবে। শিবিরে বিশেষজ্ঞরা পর্যবেক্ষণ পরিচালনা করবেন। শুক্র সংক্রমণের ঘটনা আবার ঘটবে ১২২ বছর পরে। খালি চোখে এই ঘটনা দেখার চেষ্টা করলে চোখের ক্ষতি হতে পারে। তাই অতি উৎসাহী হয়ে খালি চোখে সূর্যের দিকে তাকাবেন না।

ভারতের ইতিহাসে বিজ্ঞান
(মধ্যযুগ)

ভারতের তথাকথিত ইতিহাস বই-এ গণিতবিদ্ আর্যভট্ট কিংবা রসায়নবিদ্ নাগার্জুনের বৈজ্ঞানিক প্রতিভার পরিচয় ছাত্র-ছাত্রীরা পায় না। কিন্তু বিজ্ঞানের ইতিহাসে ভারতের বিজ্ঞানচর্চার অবদান আছে। মধ্যযুগ পর্যায়ে ভারতের ইতিহাসে বিজ্ঞান চর্চার উপর সংক্ষেপে আলোকপাত করা হল বর্তমান নিবন্ধে।

১২০০ থেকে ১৮০০ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত সময়কালকে মধ্যযুগ বলা যেতে পারে। ত্রয়োদশ ও চতুর্দশ শতাব্দীতে ভারতে জ্যোতির্বিদ্যার চর্চা হতো। এ সময়ের বিখ্যাত জ্যোতির্বিদদের কথা জানা যায় সুলতানি যুগের ঐতিহাসিক জিয়াউদ্দীন বারানির রচনা থেকে। মৌলানা হামিদউদ্দীন মতরিজ এ যুগের একজন জ্যোতির্বিদ। হাসাম নিজামি তাঁর বিখ্যাত গ্রন্থ 'তাজ-আল-মাসির'-এ রাশিচক্র, গ্রহ-নক্ষত্রের অবস্থান সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করেন। সৈয়দউদ্দিন মহম্মদ আওয়ামি তাঁর 'জমায়েত-আল-হিকায়েত' গ্রন্থে কম্পাস ও অ্যাস্ট্রোলেবের বর্ণনা দিয়েছেন। 'সিরাত-উল-ফিরোজ শাহি' গ্রন্থটি থেকে জানা যায়, সুলতান ফিরোজ শাহ তুঘলকের ইচ্ছায় জ্যোতির্বিদ্যা বিষয়ে অনেক প্রবন্ধ লেখা হয়েছিল। সূর্যগ্রহণ, চন্দ্রগ্রহণ, বৃষ্টিপাতের কারণ, নক্ষত্রপুঞ্জের অবস্থান, পৃথিবীর উপর গ্রহ-নক্ষত্রের প্রভাব বিষয়গুলি প্রাচীন জ্যোতির্বিদ্যা থেকে নিয়ে আবদুল আজিজ শামস স্থানেশ্বরী দালাইল একটি গ্রন্থ লেখেন। ১৭২৮ খ্রীষ্টাব্দে রাজা জয়সিংহ জ্যোতির্বিদ্যা বিষয়ক সারণী প্রস্তুত করেন। তিনি দিল্লী, জয়পুর, উজ্জয়িনী, বারাণসী এবং মথুরায় আকাশ পর্যবেক্ষণ কেন্দ্র প্রতিষ্ঠা করেন।

সে যুগে কিমিয়া বিদ্যা অর্থাৎ রসায়নের চর্চা হতো। ধাতু দ্রবীভবন, ধাতব লবণ তৈরি, ধাতু সনাক্তকরণ, ধাতু নিষ্কাশন, সংকর ধাতু, ধাতুর রূপান্তর, অধাতুর নানা পরিবর্তন, অধাতব যৌগ গঠন, যন্ত্রের আকৃতি ও ব্যবহার পদ্ধতি, কাচ, রত্ন, ভেষজ, গন্ধ, বর্ণ প্রভৃতি বিষয়গুলি নিয়ে কিমিয়া বিদ্যা গড়ে ওঠে। রসায়নবিদ হিসাবে চক্রপানি দত্তের বিশেষ খ্যাতি ছিল। পারদ-গন্ধক ঘটিত লবণ মারকিউরিক সালফাইড সম্ভবত তিনিই এদেশে প্রথম আবিষ্কার করেন। শাঙ্গধর রচিত 'শাঙ্গধর সংহিতা'য় ঔষধ হিসাবে ব্যবহার্য নানারকম রাসায়নিক যৌগিক ও মিশ্রণের উপর আলোচনা করা হয়েছে। ত্রয়োদশ শতাব্দীতে কাশ্মীরের নরহরি 'রাজ নির্ঘণ্ট' নামে ভেষজ শাস্ত্রের একখানি গ্রন্থ রচনা করেন। মধ্যযুগে পদার্থবিদ্যা চর্চার কথা বেশি জানা যায় না। এবিষয়ে আবুসিনার নাম উল্লেখযোগ্য।

মধ্যযুগে ইস্পাতের প্রচলন দেখা যায়। হায়দ্রাবাদের তেলেঙ্গনায়, মাদ্রাজের সালেমে এবং মহীশূরে ইস্পাত উৎপাদন হতো। ভারতীয় ইস্পাত থেকে দামাস্কাসের তলোয়ার তৈরি হতো।

এসবের মধ্যে বৈজ্ঞানিক অগ্রগতির পরিচয় পাওয়া যায়। নালন্দা, বিক্রমশীলা, ওদন্তপুরী এসব বৌদ্ধ বিশ্ববিদ্যালয়গুলিতে বিভিন্ন বিষয়ের মধ্যে কারিগরী বিদ্যাও শেখানো হতো।

সমগ্র মধ্যযুগ জুড়ে বৈজ্ঞানিক চিন্তা ভাবনার বিকাশ সুষমভাবে হয়নি। হওয়া সম্ভবও ছিল না। মোঘল আমলে বিজ্ঞান চর্চার ভীষণ অবনতি ঘটে। সুলতানি আমলে জ্যোতির্বিদ্যা ও গণিতের চর্চা হতো। কিন্তু বিশেষ কোন মৌলিক আবিষ্কার ঘটেনি।

—গোবিন্দ দাস, ২৫৮৯-১৫১২

প্রশ্নোত্তর

বিষয় : জলাশয়ের প্রয়োজনীয়তা

১৬.২.০৪ কাঁচরাপাড়া নজরুল ইসলাম মঞ্চে বিজ্ঞানমনস্কতা প্রসার কর্মসূচীর আয়োজন করা হয়েছিল। বিভিন্ন অঞ্চলের ৪২টি স্কুলের ছাত্র-ছাত্রীরা অংশগ্রহণ করেছিল। জলাশয়ের প্রয়োজনীয়তা বিষয়ে ৭ টি প্রশ্নের ষষ্ঠ শ্রেণীর ছাত্র-ছাত্রীদের দেওয়া সেরা উত্তর ছাপান হল (সামান্য সংশোধন সহ)। — সম্পাদক, বিজ্ঞান অন্বেষক।

প্রশ্ন : জলাশয় বলতে কি বোঝ?

উঃ প্রকৃত অর্থে জলাশয় হল— কোনও জলা, খাল, বিল, বাঁওড়, জমা জল—বদ্ধ বা স্রোত সম্পন্ন। জলাশয় বা জলাধার দুইভাগে বিভক্ত। খোলা বা স্রোত সম্পন্ন জলাশয় এবং বদ্ধ জলাশয়। তাছাড়াও বলা যায়, জলাশয় একটি বড় জৈব ভাণ্ডারের রক্ষাকর্তা। আবার, জলাশয়কে পরিবেশের ফুসফুস বলা হয়। নির্দিষ্ট কোন অঞ্চলের জলাবায়ুর উপর জলাশয়গুলির প্রভাব বিদ্যমান।

বীথি ভৌমিক ও জুই ঘোষ
বড়জাগুলি রাজলক্ষ্মী কন্যা বিদ্যাপীঠ।

প্রশ্ন : একটি জলাশয়ের জল কি কি কাজে ব্যবহৃত হতে পারে?

উঃ (১) একটি পুকুর নানা কাজে ব্যবহৃত হতে পারে। যেসব জায়গায় পানীয় জলের ব্যবস্থা নেই সেখানে জলাশয়ের জলকে মানুষ পানীয় জল হিসাবে ব্যবহার করে। জলাশয় থেকে মানুষ যে পরিমান অক্সিজেন পায় তা ওই জলাভূমির পাঁচগুণ আয়তনের জঙ্গলের উৎপন্ন অক্সিজেনের সমান। জলাশয় থেকে নানা রকমের শাকসবজি পাওয়া যায়। কারখানার আবর্জনা জলাশয় টেনে নেয়।

অয়ন খান, দেবাশিস ভৌমিক
বড়জাগুলি গোপাল এ্যাকাডেমি।

উঃ (২) একটি পুকুর বা জলাশয়ের জলের কাজগুলি নিম্নরূপ— জলাশয় (জলাভূমি) থেকে প্রচুরপরিমাণে শাকসবজি পাওয়া যায়। জলাশয়ের জল পানীয় জল হিসাবে ব্যবহার করা যায়। জলাশয়ের জল দিয়ে চাষ-আবাদ, গৃহের কাজ ইত্যাদি করা হয়। জলাশয়ের জল দ্বারা বিদ্যুৎ উৎপাদন করে বাড়ি বাড়ি সরবরাহ করা হয়। অগ্নি নিবারণের জন্যে জলাশয়ের জলের প্রয়োজন। কলকারখানার বর্জ্য পদার্থ নিকাশের জন্য জলের প্রয়োজন। কলকারখানার তৈরি জিনিসপত্র ঠাণ্ডার জন্য জলের প্রয়োজন। পৌরকর্তৃপক্ষ নানারূপ জলাশয়ের জল নানা প্রক্রিয়ায় শোধনের পর বাড়ি বাড়ি সেই জল সরবরাহ করে।

গার্গী সাহা ও সঞ্চারী মণ্ডল
বিধানচন্দ্র মেমোরিয়াল গভঃ গার্লস হাইস্কুল।

প্র : জলাশয় বায়ু দূষণ কিভাবে নিয়ন্ত্রণ করে?

উঃ শহরে বায়ুদূষণের ফলে কার্বন ডাই-অক্সাইড, কার্বন মনোক্সাইড, সালফার ডাই অক্সাইড প্রভৃতি বিষাক্ত গ্যাস বাতাসে ভেসে বেড়ায়। এগুলির বেশিরভাগই জলাশয়গুলি টেনে নেয়। শহর ও মফস্বলে দূষণ ক্রমেই বেড়ে চলেছে। জলাশয় না থাকলে দূষণ বাড়বে, কমবে অক্সিজেন। ফলে মানুষের হাঁপানি, সর্দি-কাশি ও অন্যান্য নানাপ্রকার বুকের রোগ বাড়বে। এইভাবে জলাশয় বায়ুদূষণ নিয়ন্ত্রণ করে।

সংস্কৃতি পোদ্দার
কাঁটাগঞ্জ গোকুলপুর আদর্শ শিক্ষায়তন।

প্র : জলাশয় সংরক্ষণের প্রয়োজনীয়তা কি কি?

উঃ জলাশয়গুলি ঠিকমত রক্ষণাবেক্ষণ করতে পারলে ঐ অঞ্চলে মাছের উৎপাদন বেড়ে যাবে। ফলে মাছের আমদানি কমবে, মাছের উৎপাদন বাড়লে ফিস্‌মিলের উৎপাদনও বাড়বে। এই ফিস্‌মিল হাঁস-মুরগির খাদ্য—যা খেলে হাঁস মুরগি বেশি পরিমাণে ডিম দিতে পারবে। এছাড়াও ডিমের খোসা মাটিতে মিশলে মাটির ক্যালসিয়াম ও ফসফরাসের পরিমাণও বাড়বে। সামগ্রিকভাবে পুষ্টির চাহিদা অনেকটাই পূরণ হবে। জলাভূমি সংরক্ষণের মধ্য দিয়ে খরা-বন্যা সমস্যা বহুক্ষেত্রেই সমাধান করা যায়। আঞ্চলিকভাবে যদি খাল-বিল-পুকুরগুলির গভীরতা নির্দিষ্টভাবে বৃদ্ধি করা যায় তবে জলধারণ ক্ষমতা বাড়বে, পাশাপাশি ঐ জল বহুক্ষেত্রে পানীয় জল হিসাবে ব্যবহার করা যেতে পারে। পাশাপাশি আমাদের রাজ্যে জলে আর্সেনিক দূষণ সমস্যাটির অনেকাংশে সমাধানের দিকে এগোনোর সম্ভাবনা উজ্জ্বল হয়ে উঠবে।

প্রিয়াঙ্কা কর ও অনিতা সরকার
পলাশী আচার্য দুর্গাপ্রসন্ন গার্লস হাইস্কুল।

প্র : জলাশয় না থাকলে কি কি ক্ষতি হত বলে তুমি মনে কর?

উঃ জলাশয় না থাকলে খরা হতো, চাষের জমি শুকিয়ে যেতো। ফলে অনাহারে মৃত্যুবরণ করতে হত।

কৌশিক আতর্থী ও সুমন মণ্ডল
বালিভাড়া সরস্বতী বিদ্যামন্দির।

প্র : জলাশয় রক্ষায় তুমি কি করতে পার?

উঃ জলাশয় রক্ষার জন্য বিভিন্ন যেখানে জলাভূমি ভরাট করার বিরুদ্ধে আবেদন করা যায় সেখানে আবেদন করব। খবরের কাগজে ছাপিয়ে দেব। টিভি এবং রেডিওতে জলাশয় রক্ষার জন্য আবেদন প্রচার করতে বলব। গ্রাম ও শহরের বাড়িতে বাড়িতে গিয়ে বোঝাব।

কৌশিক আতর্থী ও সুমন মণ্ডল
বালিভাড়া সরস্বতী বিদ্যামন্দির।

প্র: জলাশয় ভরাটের বিরুদ্ধে কোথায় অভিযোগ করা যায়?

উঃ জলাশয় ভরাটের বিরুদ্ধে যেসব যায়গায় অভিযোগ করা যায় সেগুলি হল— ব্লক ল্যান্ড এ্যান্ড ল্যান্ড রিফর্মস অফিসার, সাবডিভিশনাল ল্যান্ড এ্যান্ড রিফর্মস অফিসার, ডিস্ট্রিক্ট ল্যান্ড এ্যান্ড রিফর্মস অফিসার, ডিস্ট্রিক্ট ফিসারিজ অফিসার, পরিবেশ আদালত কলকাতা হাইকোর্ট।

প্রত্যুষ দাশগুপ্ত ও সৌরভ সরকার
কাঁচরাপাড়া হাইস্কুল।

বিজ্ঞান অন্বেষক পত্রিকাটির সর্বস্বত্ব বিজ্ঞান দরবার সংস্থা কর্তৃক সংরক্ষিত। সম্পাদক মণ্ডলী— প্রতুলকুমার দাস, দীপক মজুমদার, বিজয় সরকার, সুরজিৎ দাস ও সুজয় বিশ্বাস (বিজ্ঞান দরবারের পক্ষে)। ফোন - ২৫৮৫ ৬০৩২, ২৮৭৬ ০৭২০, ২৫৮৮ ০৮২১, ২৫৮৭ ৬২৭৫

স্বত্বাধিকারী ও প্রকাশক জয়দেব দে কর্তৃক ৫৮৫ অজয় ব্যানার্জী রোড (বিনোদ নগর) পো: কাঁচরাপাড়া, পিন-৭৪৩১৪৫, জেলা- উত্তর২৪পরগণা থেকে প্রকাশিত এবং তৎকর্তৃক স্ক্রীন আর্ট, ২০ নেতাজী সুভাষ পথ, পো: কাঁচরাপাড়া, জেলা- উত্তর ২৪পরগণা, পিন-৭৪৩১৪৫ থেকে মুদ্রিত।

সম্পাদক—শিবপ্রসাদ সরদার।

E.mail- ganabijnan@yahoo.co.in.